# ভাষা- আন্দোলনের নাশকতা
## ফিরোজ মাহবুব কামাল

ভাষা- আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলার স্বীকৃতি লাভ ছিল না। বরং পাকিস্তান এবং যে প্যান- ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তার বিনাশ এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান খন্ডিত হয়েছে, বাংলাদেশও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামি চেতনা বিনাশের কাজ এখনও শেষ হয়নি, তাই শেষ হয়নি ভাষা আন্দোলনের নামে বাঙালীর চেতনা জগতে সেকুলার ধারার সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক বিপ্লবের কাজ। ভাষা আন্দোলনের নাশকতা এখানেই। ভাষা আন্দোলনের নেতা- কর্মীদের দাবী, ভাষা আন্দোলন না হলে বাঙালী জাতিয়তাবাদ কখনই এতটা প্রচন্ডতা পেত না এবং বাংলাদেশও সৃষ্টি হতো না। তাদের এ যুক্তি অস্বীকারের উপায় নেই। তাই ১৯৪৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের কল্যাণচিন্তা, ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে মুসলমানদের আবার উত্থান - এসব নানা স্বপ্ন মাথায় নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। ভাষা- আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে স্বপ্নেরই মৃত্যু হয়েছে। তবে সে স্বপ্নের বিনাশই ভাষা- আন্দোলনের একমাত্র নাশকতা নয়, এখন সে আন্দোলনের সেকুলার চেতনাকে লাগাতর ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামী চেতনার উত্থান রোধের কাজে।

আজ যেভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি, আইন আদালত, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম এক পরাজিত শক্তি এবং বিজয়ী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ইসলামের বিপক্ষ শক্তি তার মূল কারণ তো এ ভাষা- আন্দোলন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি এক গুণগত পরিবর্তন। উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতিতে বহু ঘটনা ঘটেছে, তবে যে ঘটনাটি ভারতের আধিপত্যবাদী হিন্দুদের প্রচুর আনন্দ জুগিয়েছে এবং সে সাথে তাদেরকে প্রচন্ড লাভবানও করেছে তা হলো এই ভাষা আন্দোলন। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়েও তারা খুশি হয়েছিল। সিরাজদ্দৌলার পরাজয়কে ইংরেজদের সাথে হিন্দুগণও উৎসবযোগ্যরূপে গণ্য করেছে। সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রে কালীমা লেপন করে বহু হিন্দু কবি- সাহিত্যিক বহু কবিতা, বহু উপন্যাস ও বহু নাটক লিখেছেন। তাদের কাছে নোংরা মনে হয়নি মীর জাফর ও ক্লাইভের চরিত্র। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাপদাদাগণই যে শুধু ইংরেজদের প্রশংসায় গদগদ ছিলেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইংরেজ রাজাকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা বলে কবিতা লিখেছেন। 'জয়ো হে' 'জয়ো হে' হে ভারত ভ্যাগ্যবিধাতা বলে জয়োধ্বণিও দিয়েছেন। ইংরেজদের থেকে নাইট উপাধীও পেয়েছেন। তবে মুসলমানগণ ১৭৫৭ সালের সে পরাজিত দুরাবস্থা থেকে গাঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই ফল দাঁড়িয়েছিল, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে যখন থেকে ভারতে নির্বাচন দেওয়া শুরু হলো তখন থেকে বাংলার শাসন ক্ষমতায় কোন হিন্দুকে বসতে দেইনি। অথচ তখন মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় খুব একটি বেশী ছিল না। জনসংখ্যার ৫৫% হলেও অর্থনীতি, শিক্ষা, চাকুরি ও ব্যবসা- বাণিজ্যে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা হিন্দুদের তুলনায় ছিল বিশাল। তারপরও শতকরা ৭০ ভাগ হিন্দু অধ্যুষিত কোলকাতায় বসে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি ১১ বছর মুসলমান প্রধানমন্ত্রী শাসন করেছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে মুসলমানরা হিন্দু ও ইংরেজদের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও লড়াই করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুসলমানদের জন্য এ ছিল বিরাট বিজয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলন মুসলমানদের কোমরই ভেঙ্গে দিয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি, ভাতৃঘাতি লড়াই, পাকিস্তানের ধ্বংস এবং ইসলামী চেতনা বিনাশের বীজ বপন করা হয়েছিল এ আন্দোলনে। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই প্রতিষ্ঠা পায় বাংলাদেশ। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির উত্থানের যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয় সেটিই মাঠে মারা যায়। এ জন্যই আজ মহা আনন্দ ভারতীয় আগ্রাসনবাদীদের। কারণ বাংলাদেশ এবার পাকাপোক্তভাবে ধরা দিয়েছে তাদের ফাঁদে। এখন আর বেরুনোর পথ নেই।

অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব শেরেবাংলা ফজলুল হক বলতেন, কোলকাতার হিন্দু পত্রিকাগুলো যখন আমার পক্ষে লেখা শুরু করে তখনই বুঝতে হবে আমি মুসলমানদের জন্য বড় রকমের ক্ষতি করছি। তিনি একথা বলতেন আধিপত্যবাদী বর্ণহিন্দুদের মুসলিম স্বার্থবিরোধী মানসিকতার সাথে তার নিখুঁত পারিচয় থাকার কারণে। ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১য়ে পাকিস্তানের ভেঙ্গে যাওয়া নিয়ে কোলকাতার পত্রিকাগুলো শুধু পক্ষেই লেখেনি, মুসলিম ইতিহাসের এ দু' টি ঘটনাকে তারা নিজেদের জন্যও উৎসবে পরিণত করেছে। ১৯৭১ সালে তো তারা নিজেদের বিশাল সামরিক শক্তিকেও ব্যবহার করেছে। ফলে জনাব ফজলুল হকের মতানুযায়ী,

মুসলমানদের ক্ষতির মাত্রা বোঝার জন্য এখন আর গবেষণার প্রয়োজন নেই। সেটি সুস্পষ্ট তাদের উল্লাসের মাত্রা দেখে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে অতি মিথ্যাচার হয়েছে বাংলা ভাষা ও ভাষা- আন্দোলন ঘিরে। ভাষা- আন্দোলন নিয়ে যাদের গর্ব তাদের সবচেয়ে বড় মিথ্যাটি হলো, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নাকি ষড়যন্ত্র করেছে পাকিস্তান সরকার। অভিযোগ তুলেছে, বাঙালীর মুখ থেকে বাংলা ভাষাকেই নাকি পাকিস্তান সরকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। অথচ সে সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ঢাকার সন্তান খাজা নাযিম উদ্দীন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন আরেক বাংলাভাষী জনাব নুরুল আমীন। ঘটনা শুধু মিথ্যারটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভাষা আন্দোলন পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে পাকিস্তানের শিকড় কাটার কাজে। এবং ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে সেকুলার চেতনা ও সেকুলার সংস্কৃতির প্রচারে। পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধেই। বাংলা ভাষার উন্নয়নে বাংলা এ্যাকাডেমী ও বাংলা- উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী ভাষার বিপুল সংখ্যক বইয়ের বাংলায় তরজমার ন্যায় অনেক কাজই তখন করা হয়। বলা যায়, বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার কাজে সরকারি ভাবে পাকিস্তানের ২৩ বছরে যে কাজ করা হয় তা অতীতে হাজার বছরেও হয়নি। বাংলা ভাষার উন্নয়নে পশ্চিম বাংলাতেও এত সরকারি বিণিয়োগ হয়নি। কিন্তু এরপরও ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের প্রয়োজন থেমে যায়নি। বরং দিন দিন সেটিকে প্রবলভাবে বেগবান করা হয়েছে। এবং এখনও হচ্ছে। সেটি মূলতঃ দুটি কারণে। একটি রাজনৈতিক, অপরটি আদর্শিক। রাজনৈতিক প্রয়োজনটি ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার লক্ষ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃনা সৃষ্টির কাজে এ আন্দোলনকে ব্যবহার করা। আদর্শিক প্রয়োজনটি হলো, বাংলার মুসলমানদের মন ও মনন থেকে ইসলামি চেতনার বিনাশ এবং সে সাথে সেকুলারিজম আবাদে সেটিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেকুলারাইজেশনের কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনও শেষ হয়নি। থেমে যায়নি প্রভাতফেরীর নামে হাজার হাজার নারীপুরুষকে একত্রে রাতের আঁধারে রাস্তায় নামানোর আয়োজন। বরং ইসলামী চেতনার দ্রুত বিকাশ এবং ইসলামী রাষ্ট্রবিপ্লবের আন্দোলন দেশে দেশে প্রবলতর হওয়ায় গুরুত্ব বেড়ে গেছে একুশে ফেব্রুয়ারির। এবং সেটি বুঝা যায় একুশে ফেব্রুয়ারি উৎযাপনের বর্তমান মাত্রা দেখে। একুশের বই মেলা পরিণত হয়েছে সেকুলার চেতনা- ভিত্তিক সাহিত্যের প্লাবন সৃষ্টির কাজে। পাকিস্তান আমলে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালিত হতো বছরের মাত্র একটি দিনে, এবং সেটিও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। সে আমলে সেকুলার এবং বামপন্থি ছাত্র- ছাত্রীরাই শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নগ্নপদে স্মৃতীস্তম্ভে গিয়ে ফুল চড়াতো। এসব ছাত্র- ছাত্রীরা ছিল মূলতঃ আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও সমর্থক। সাধারণ ছাত্র- ছাত্রীরা এ থেকে সচেতনতার সাথে দূরে থাকতো। যাদের মধ্যে ইসলামের সামান্য জ্ঞান ছিল এবং ইসলামের অনুশাসন পালনে সামান্য অঙ্গিকার ছিল, স্তম্ভের সামনে দাড়িয়ে তারা এমন সম্মান প্রদর্শনকে নির্ভেজাল শিরক মনে করতো।

আদর্শের জন্য প্রাণদান ইসলামে নতুন কিছু নয়, নবীজী ( সাঃ) র সাহাবাদের অর্ধেকের বেশী শহীদ হয়েছেন। ‘শহীদ’ শব্দটিও এসেছে ইসলাম থেকে। শহীদদের রক্তের বরকতেই আল্লাহর রহমত প্রাপ্তি ঘটেছিল এবং নির্মিত হয়েছিল মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা। আমরা মুসলমান হয়েছি তো তাদের রক্তদানের ফলেই। সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে যা কিছু গর্বের তার বেশীর ভাগের নির্মাতা তারাই। বিশ্বের সকল মুসলমানদের কাছে তাই তারা সর্বকালের পরম সম্মানের পাত্র। কিন্তু ইসলামে সম্মান প্রদর্শনেরও নিজস্ব রীতি আছে। সেটি স্তম্ভ গড়ে নয়। স্তম্ভের গোড়ায় ফুল দিয়েও নয়। রাতে বা প্রভাতে নারী- পুরুষকে রাস্তায় নামিয়েও নয়। শহিদদের স্মৃতিতে স্তম্ভ গড়া সিদ্ধ রীতি হলে শুধু মক্কা, মদীনাতে নয়, মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য শহরে হাজার হাজার স্তম্ভ গড়া হতো। সেসব স্তম্ভে বছরের একটি দিনে শুধু নয়, প্রতিদিন ফুল দেওয়া হতো। কিন্তু সেটি হয়নি। কারণ সেটি মুসলিম সংস্কৃতি নয়। ইসলামসিদ্ধও নয়। অথচ বাংলাদেশের নগরে বন্দরের প্রতিটি স্কুল- কলেজে বহু লক্ষ স্তম্ভ গড়ে সেটিকে আজ বাঙালীর সংস্কৃতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এভাবে মুসলিম জীবনে শুরু হয় চরম সাংস্কৃতিক পথভ্রষ্টতা। এ সাংস্কৃতিক ভ্রষ্টতা এসেছে আদর্শিক ভ্রষ্টতা থেকে। বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশে দেহব্যবসার মত ব্যাভিচার যেমন আইনগত বৈধতা পেয়েছে তেমনি সংস্কৃতি রূপে বৈধতা পেয়েছে নগ্ন পদে স্তম্ভে গিয়ে ফুল দেওয়া। এমন সাংস্কৃতিক ভ্রষ্টতার পিছনে ভ্রষ্ট দর্শনটি হলো সেকুলারিজম – যার মূলকথা পরকালের ভাবনা বিলুপ্ত করে মানুষকে দুনিয়ামুখি করা। মানুষের ঢল মসজিদমুখি না করে স্তম্ভমুখি করা। বাঙালী মুসলমানদের জীবনে

এভাবেই নেমে এসেছে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক কনভার্শন। সংস্কৃতির পথ ধরে এভাবেই চরম দুষণ ঘটেছে বাংলার মুসলমানদের চেতনালোকে। ইসলামের শত্রুদের আজকের স্ট্রাটেজী মুসলমানদেরকে আবার পুতুল পুঁজাতে ফিরিয়ে নেওয়া নয়। বরং সংস্কৃতির লেবাসে এমন সব বিশ্বাস ও রীতিনীতিতে অভ্যস্থ করা যা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকেই দূরে সরিয়ে নেয়। আর এভাবেই মুসলিম মানসে প্রচন্ড ভ্রষ্টতা বাড়ানো হয়েছে ইসলামে। ফলে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে অনিবার্য পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামের লাগাতর পরাজয়। এবং সেটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক ভাবে। সেকুলারিজমের প্রচার ও প্রভাব বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এতটাই গভীরতর হয়েছে যে, বহু ইসলামপন্থি নেতাকর্মীও সে স্রোতে ভেসে গেছে। ফলে এখন আর শুধু আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কম্যিউনিষ্ট পার্টির নেতা- কর্মীগণই নগ্ন পদে ফুলের মালা নিয়ে স্মৃতীস্তম্ভে গিয়ে হাজির হচ্ছে না, হাজির হচ্ছে তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতাকর্মীও। রাজনৈতিক বিজয়ের পাশে বাংলাদেশের সেকুলারিষ্টদের জন্য এটি হলো এক আদর্শিক বিজয়। হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) এর অনুসারিগণ যে আজ মুর্তিপুঁজায় ফিরে গেছে তা নয়, বরং তারা সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক ভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এবং সে পথভ্রষ্টতার কারণেই তারা বিদ্রোহী হয়েছে আল্লাহর ফরমানের বিরুদ্ধে। ফলে সমগ্র খৃষ্টান ও ইহুদী জগতে আল্লাহর বিধান আজ পরাজিত। পুরাতন টেস্টামেন্টের বিধানগুলো তাই শুধু কেতাবেই রয়ে গেছে। একই ভাবে পথভ্রষ্টতা নেমে এসেছে বাংলাদেশেও।

জনগণের মাঝে আদর্শিক বা সাংস্কৃতিক ভ্রষ্টতা সার্বজনীন করার স্বার্থেও ইন্সটিটিউশন চাই। মুর্তিপুজার ন্যায় সনাতন পথভ্রষ্টতা ও মিথ্যাচার বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে মুর্তিগড়া ও এসব মুর্তির পদতলে ফুল দেওয়া হলো হিন্দুদের ধর্মীয় ইন্সটিটিউশন। সে আচার বাঁচিয়ে রাখতে বাংলার হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বারো মাসে তের পার্বন। একই আদলে বাংলাদেশের সেকুলারিষ্টগণও ভাষা আন্দোলনের নামে বাংলাদেশের নগর- বন্দরেই শুধু নয়, গ্রাম- গঞ্জেও স্মৃতিস্তম্ভের নামে বিপুল সংখ্যায় ইন্সটিটিউশন গড়ে তুলেছে। বস্তুতঃ বাংলার সেকুলারিষ্টদের এটিই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ইনস্টিটিউশন। একুশের নামে প্রতিবছর যে অনুষ্ঠান হয় সেগুলীর মূল লক্ষ্য ভাষায় সমৃদ্ধি আনা নয়, বরং তা হলো, সেক্যুলার ধারণাকে আরো প্রবলতর করা এবং সে সাথে দীর্ঘজীবী করা। ভাষায় সমৃদ্ধি আনা লক্ষ্য হলে, সে জন্য কি নগ্নপদে মিছিল ও স্তম্ভে ফুলদানের প্রয়োজন পড়ে? রাষ্ট্রভাষা রূপেও কি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে? উর্দু ভাষা ব্রিটিশ আমলে রাষ্ট্র ভাষা ছিল না। কিন্তু সে ভাষার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে সে সময়। উর্দু ভাষায় পবিত্র কোরআনের বহু অনুবাদ ও বহু তফসির লেখা হয়েছে। বহু তরজমা ও বহু ব্যাখা লেখা হয়েছে হাদীসগ্রন্থগুলীরও। অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে ফিকাহ শাস্ত্র, নবী- জীবনী, সাহাবা- জীবনী, দর্শন ও ইতিহাসের উপর। সমৃদ্ধি এসেছে উর্দু প্রবন্ধ, কবিতা ও গজলে। কিন্তু বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম রাষ্ট্রে রাষ্ট্র- ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরও বাংলা ভাষায় উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে? বাংলা ভাষার যা কিছু উন্নয়ন হয়েছে তা হয়েছে বাঙালী হিন্দুদের দ্বারা। এবং সে উন্নয়ন হয়েছে তখন যখন বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা ছিল না।

বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের নামে যা কিছু হয়েছে তা মূলতঃ হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। আর এমন একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এখনও অপূর্ণ থাকায় একুশে ফেব্রুয়ারী পালনে সেকুলারিষ্টদের উদ্যোগে কমতি আসছে না, বরং দিন দিন সেটিকে আরো তীব্রতর করা হচ্ছে। আগের মত একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর কয়েক ঘন্টার প্রোগ্রাম নয়, সেটা পালন হয় সমগ্র ফেব্রুয়ারি মাস ধরে। অথচ তাদের মনযোগ নাই বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করার কাজে। বাংলাদেশের মানুষের চেতনার উন্নয়ন, নৈতিকতার উন্নয়ন ও বাংলা ভাষার উন্নয়ন নিয়ে পশ্চিম বাংলার একজন হিন্দুর অভিমতটি শোনা যাক। পশ্চিম বঙ্গের দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য নামক একজন শিক্ষক ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের বাঙালীদের নিয়ে যা লিখেছিলেন তা থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। লিখেছিলেন,

“আরো দুঃখ্য হয় আদর্শের নামে আপনাদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জনগণকে অপরাধে উৎসাহিত করছে। হিন্দু হিসাবে আমি মুসলমান মৌলবাদকে ভয় করি কিন্তু গণ আদালত করে কোন মৌলবাদীকে হত্যার হুমকি দেয়া, এটা কোন দেশে এভাবে প্রচলিত আছে বলে আমার জানা নেই। লক্ষ্য করেছি, আপনারা আইন- আদালতের রায়কেও মানতে চাচ্ছেন না। এ কোন ধরণের সভ্যতা। এখানে শুনলাম, কিছুকাল আগে জামায়াতের এক নেতা ইউনিভার্সিটিতে প্রহৃত হয়েছেন (এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রহৃত হওয়ার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে)। আশ্চর্য লাগলো যখন শুনলাম একদল ইউনিভার্সিটির শিক্ষকই এ ঘটনার

সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছেন। আশ্চর্য এ দেশে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। আপনাদের আর্ট- কালচার দেখেও আমি হতাশ হয়েছে। ২২ বছরে আপনারা এমন একটি বই প্রকাশ করতে পারেননি যা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে উপভোগ করা যায়। আমি হুমায়ুন আহমদের কয়েকটি বই পড়বার চেষ্টা করেছিলাম। রচনার মান অতি নিম্নমানের। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের জীবনের কোন সামগ্রিক চিত্র এর মধ্যে পেলাম না। শুনেছি, তিনি নাকি এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তার কয়েকটা ছোট গল্প এবং একটা উপন্যাস পাঠ করার পর আমার ধারণা জন্মেছে, পাঠকের পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয়ার ক্ষমতা তার আছে। এর অধিক কিছু নেই। এরকম একজন লোক জনপ্রিয় হতে পেরেছেন এ দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে, এদেশের শিক্ষার মান কত নীচু"। - ( সুত্রঃ সরকার শাহাবুদ্দীন আহম্মদ, ২০০৪)

এনিয়ে বিতর্ক নেই, মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম নেই। কিন্তু শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষ রূপে বেড়ে উঠার স্বার্থে মনের ভাব প্রকাশ করাটাই একমাত্র কাজ নয়। অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জ্ঞানলাভ করাটাও। নইলে মনের ভাবেরও সভ্যতর প্রকাশ ঘটে না। তাই মাতৃভাষাকে শিক্ষার ভাষা, জ্ঞানের ভাষা এবং সংস্কৃতির ভাষাও হতে হয়। এ বিচারে মুসলমানের ক্ষেত্রে ভাষার দায়িত্বটা আরো বেড়ে যায়। ভাষাকে তখন সিরাতুল মোস্তাকিম তথা জান্নাতের পথ দেখানোর দায়িত্বটা পালন করতে হয়। বান্দাহর উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ ও তার মহান রাসূল ( সাঃ) এর কথাগুলোও তাই ভাষাকে শেখাতে হয়। একটি ভাষার এটিই হলো সবচেয়ে বড় দায়বদ্ধতা, যেমন খাদ্যের সবচেয়ে বড় দায়বদ্ধতা হলো পুষ্টি জোগানো। তাতে নিছক মুখরোচক স্বাদ থাকলেই চলে না। নিজ দেশে বা নিজ ঘরে খাদ্য না থাকলে এজন্যই বাঁচার তাগিদে খাদ্যের সন্ধানে নামতে হয়। নইলে অনিবার্য হয় মৃত্যু। তেমনি চেতনার মৃত্যু ও ঈমানের মৃত্যু ঠেকাতে মুসলমানকে এমন ভাষা শিখতে হয় যে ভাষায় ঈমানের খাদ্য মেলে। এমন এক দায়বদ্ধতার কারণেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী আজও আরবী শেখে। অনেকে উর্দুও শেখে। এভাবে অন্যভাষা শিক্ষার মধ্যে বাংলাভাষার বিরুদ্ধে শত্রুতা কোথায়? ষড়যন্ত্রই বা কোথায়? ইসলামের জ্ঞান না থাকলে মুসলমানের পক্ষে তখন মুসলিম রূপে বেড়ে উঠাই অসম্ভব। ইসলামে জ্ঞানার্জন ফরয তো মুসলমান রূপে বেড়ে উঠার তাগিদেই। মাতৃভাষা ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ না হলে তখন অন্য ভাষার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বাংলার মুসলমানদের একারণেই শত শত বছর ধরে প্রথমে আরবী ও ফার্সী এবং পরে উর্দু ভাষার দরবারে ছুটতে হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের বেশীর ভাগই হিন্দুদের রচিত। হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের পার্থক্য শুধু খাদ্যপানীয়তেই নয়। দেহের খাদ্যের ন্যায় বিশাল পার্থক্য রয়েছে উভয়ের মনের খাদ্যতেও। মুসলমান নিছক সাহিত্যরস উপভোগের স্বার্থে সাহিত্যপাঠ করেনা। তাকে সে পাঠের মাধ্যমে ঈমানকেও বাঁচাতে হয়। ফলে বাঙালী হিন্দুদের রচিত বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন পুরণ হওয়ার ছিল না। বরং তাতে ভয়ানক ক্ষতিসাধনের ভয় ছিল। কারণ হিন্দুগণ বই লিখেছেন তাদের নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনে। মুসলমানদের প্রয়োজন তারা পুরণ করবে সেটি কি আশা করা যায়? বিশ্বে ভাষার সংখ্যা হাজার হাজার। কিন্তু সব ভাষার কি সামর্থ আছে? বাংলা, পাঞ্জাবী, গুজরাতি, সিন্ধি, কাশ্মিরী, পশতু, অসমীয়, তেলেগুসহ অনেক ভাষা রয়েছে দক্ষিণ এশিয়াতেও। কিন্তু এসব ভাষায় ইসলামী জ্ঞানের বিশাল ভূবন দূরে থাক, মাত্র শত বা দেড় শত বছর আগে কোরআন ও হাদীসের কোন অনুবাদও ছিল না। সমস্যা হলো কোন ভাষায় সেটি রাতারাতি গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। এ কাজে শত শত বছর লাগে। উপমহাদেশের মুসলমানগণ পূর্বে সে অভাব পুরণ করতো সাধারণতঃ ফার্সী ও আরবী ভাষা শিখে। ইংরেজরা ফার্সীকে বিলুপ্ত করে দেয়। তখন উপমহাদেশের মুসলমানগণ মনযোগী হয় সম্মিলিত ভাবে উর্দু ভাষাচর্চা ও সেটিকে সমৃদ্ধ করার কাজে। তাই উর্দূ ভাষার আজ যে সমৃদ্ধি তার পিছনে ভারতে বিশেষ কোন একটি এলাকার মুসলমানদের অবদান বললে ভূল হবে। এতে অবদান রয়েছে উত্তর ভারতের মুসলমানদের সাথে দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদেরও। অবদান রয়েছে পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের সাথে পূর্ব ভারতের মুসলমানদেরও। এদিক দিয়ে মুসলমানগণ হিন্দুদের চেয়েও অগ্রসর ছিল। হিন্দুদের তখনও সর্বভারতীয় কোন ভাষা দূরে থাক, বর্ণমালাই ছিল না। হিন্দিতে দেবনাগরীর প্রচলন আসে অনেক পরে। তাদেরকে শব্দভান্ডার গড়ে তুলতে সাহায্য নিতে হয় সংস্কৃত ভাষার ন্যায় একটি মৃত ভাষা থেকে। অথচ মুসলমানগণ উর্দুকে সমৃদ্ধ করে আরবী ও ফার্সীর ন্যায় দুটি জীবন্ত ভাষা থেকে। ফলে উর্দু পরিণত হয় একটি প্রাণবন্ত ভাষায়। পরিণত হয় একটি প্যান- ইসলামিক ও প্যান- ভারতীয় ভাষা।

উর্দুই ছিল সে সময় একমাত্র ভাষা যা বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, হায়দারাবাদ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মির, গুজরাট, মাদ্রাজসহ তথা সর্বভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের প্রায় সবাই বুঝতো। কিন্তু সে মর্যাদা বাংলার ছিল না। সিন্ধি, পাঞ্জাবী বা পশতু ভাষারও ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষার করার দাবী উঠে বস্তুতঃ সে প্রেক্ষাপটেই। তাই এটিকে বাংলার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র বলা যায়? অথচ তাই বলা হয়েছে। বাংলার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে দাবী উঠে সেটি নিছক পাকিস্তানে বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে। কিন্তু পূর্ব বাংলার পাশাপাশি পাকিস্তানে যে আরো ৪টি প্রদেশ আছে সে বিষয়টিকে ভাষা আন্দোলনের নেতারা বিবেচনায় আনেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই তারা দাবী তুলেছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হলেও বাংলা ছিল নিছক একটি প্রাদেশিক ভাষা, বাংলার বাইরে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। এমন একটি ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলে কি পাকিস্তান লাভবান হতো? অথচ উর্দু পাকিস্তানের কোন একটি প্রদেশের ভাষা না হলেও সব প্রদেশের শিক্ষিত মানুষেরা সে ভাষাকে বুঝতো। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ হাছিলের লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলনের নেতারা সে সত্যটা সেদিন বুঝতে রাজী হয়নি। পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন কায়েদে আযম মহম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি ছিলেন গুজরাটি। উর্দু তার মাতৃভাষা ছিল না। কিন্তু তাঁর নিরপেক্ষ বিচারে উর্দুর কোন বিকল্প ছিল না, কারণ উর্দুই ছিল সমগ্র পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা। পাকিস্তানী নেতারা তখন পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে একটি মাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতি ছিলেন। একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলে তাতে সংহতি না বেড়ে বিভক্তি বাড়বে, সে আশংকা তাদের ছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের নেতাদের যুক্তি ছিল, একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলে পাকিস্তান দূর্বল হবে না বরং শক্তিশালী হবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাদের যুক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এবং শতভাগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে তাই যা পাকিস্তানের তৎকালীন নেতারা আশংকা করেছিলেন। সে সময়ের পাকিস্তানী নেতাদের ভূল- ত্রুটি যাই থাক, এত বড় সত্যকে বুঝতে তারা ভূল করেননি। অথচ বাঙালী জাতিয়তাবাদে ভেসে যাওয়া গর্বিত কুপমন্ডুক বাঙালী নেতাদের সে সামান্য সামর্থটুকুও ছিল না। কুপের ব্যাঙ সমুদ্রে ছেড়ে দিলেও সে গর্তের তালাশ করে। তেমনি বাঙালী নেতারাও নিজেদের বন্দী করে ভারত ঘেরা ক্ষুদ্র বাংলাদেশের চার দেওয়ালের মাঝে। তাই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মানচিত্রে ফিরে আসার সংগ্রামের শুরু একাত্তরে নয়, ১৯৪৭ থেকেই। সে সত্যটিই প্রকাশ পায় যখন শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে দেশে ফিরে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী সোহরোয়ার্দী উদ্দ্যানের জনসভায় বল্লেন, "স্বাধীনতার সংগ্রামের শুরু একাত্তর থেকে নয়, সাতচল্লিশ থেকেই।" বাঙালীরা নিজেরা নিজেদের দেশও কখনোই শাসন করেনি। পাল বা সেন রাজাও বাঙালী ছিল না। ফলে বিশ্বের সর্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্বভার হাতে নেওয়ার যে গণতান্ত্রিক সুযোগটি এসেছিল সে দায়ভার নেয়ার আগেই জোয়ালই ঢেলে দেয়। সমগ্র মানব ইতিহাসে এটি এক বিরল দৃষ্টান্ত।

ঈমান বাঁচাতে যে ভাষায় কোরআনের জ্ঞান পাওয়া যায় মুসলমানকে সে ভাষা থেকেই জ্ঞানাহরন করতে হয়। মুসলমানের জীবনে সে তীব্র ক্ষুধাটি আসে তার ঈমান থেকে। মিশর, সূদান, আলজেরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইরাক, সিরিয়া, লেবাননের ন্যায় বহু দেশের মানুষ সে ফরজ পালনের তাগিদে নিজেদের মাতৃভাষাকে দাফন করে আরবী ভাষাকে নিজেদের ভাষা এবং সে সাথে রাষ্ট্রের ভাষা রূপে গ্রহন করেছিল। কারণ তারা বুঝেছিল, মাতৃভাষা পুজায় জ্ঞানার্জনের ফরয পালন হবে না। তাতে আত্মা পুষ্টি পাবে না, ঈমানও বাঁচবে না। একমাত্র ইসলামী জ্ঞানই সন্ধান দেয় সিরাতুল মোস্তাকিমের। তখন মুক্তি আসে এ দুনিয়ায় ও আখেরাতে। নইলে ব্যর্থ হয় সমগ্র বাঁচাটাই। এ ঈমানী উপলদ্ধিটি বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে সাতচল্লিশের পূর্বে যেমন ছিল, সাতচল্লিশের পরও ছিল। এমন একটি আত্মীক ক্ষুধা বাংলার ন্যায় পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানের ন্যায় অ- উর্দুভাষী প্রদেশেও ছিল। ঈমানের এমন দাবীতে অনেক বাঙালী মুসলমান আরবী হরফে বাংলা লেখার চিন্তাভাবনাও করেছিলেন। তাদের যুক্তিটি ছিল, হিন্দুদের রচিত বাংলা সাহিত্য মুসলিম মানসে দুষিত চিন্তার জীবাণু ছড়াবে। পাইপ যোগে ঘরে দূষিত পানি পৌঁছতে থাকলে তাতে দেহ বাঁচে না। তেমনি ঈমানও বাঁচে না চেতনায় দূষিত দর্শনের জীবাণু পৌছতে দিলে। বাঙালী হিন্দুগণ মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করতে না পারলেও আজ সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব করছে এভাবেই। রবীন্দ্রনাথের মত মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু আধিপত্যবাদের কবি পরিণত হয়েছে বাঙালী সেকুলারিষ্টদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক গুরুতে। অথচ এই সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কোলকাতার রাজপথে প্রতিবাদে নেমেছিলেন। তিনি জানতেন, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ করার ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া। মুসলিম- প্রধান পূর্ববাংলার জন্য এ ছিল ব্রিটিশ সরকারের ওয়াদা। কিন্তু মুসলমানদের সে উপকার সাম্প্রদায়ীক

রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগেনি। ভাল লাগেনি কোলকাতার হিন্দু পত্রিকাগুলোরও। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তখন মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলে ব্যাঙ্গ করতো। জমিদার রূপে রবীন্দ্রনাথ নিজে রাজস্ব তুলতেন পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দুঅধ্যুষিত বোলপুরে। তিনি তার ছোটগল্প সমস্যাপূরণে গরীব কৃষক অছিমুদ্দিনকে হিন্দু জমিদারের জারজ সন্তান রূপে চিত্রিত করেছেন। যিনি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষিত হওয়াকে পছন্দ করেননি তার গান পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে।

হিন্দুদের রচিত মুসলিম বিদ্বেষী বাংলা সাহিত্যের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতেই বাংলা ভাষার হরফ পাল্টানোর যুক্তি পেশ করেছিলেন অনেকেই। তাদের যুক্তি ছিল, এতে বাঁচবে বাংলার মুসলিম মানস। এবং সংযোগ বাড়বে আরবী ও উর্দুর সাথে। এতে সমৃদ্ধি আসবে বাংলা ভাষায়। তাদের কথা, হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য এক নয়। যেমন এক নয় উভয়ের ধর্ম, জীবনবোধ ও দর্শন। উর্দু ও হিন্দির জন্ম মূলত একই ভৌগলিক এলাকায়। কিন্তু দু' টি ভাষার মাঝে গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল দেওয়াল এবং সেটি শুধু বর্ণমালার নয়, শব্দ, উপমা ও দর্শনের। একই ভূমিতে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও উর্দু ছুটেছে আরবী- ফারসীর দিকে। আর হিন্দি ছুটেছে সংস্কৃত ভাষার দিকে। ঈমান বাঁচানোর সে তাগিদে বাংলার মুসলমানদেরও অনেকে তাই আরবী হরেফে বাংলা লেখার কথা ভাবতেন। কিন্তু সে জন্য কি পাকিস্তানকে দায়ী করা যায়? কিন্তু সেটিই হয়েছে। এমন এক পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার উর্দুকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তা সত্য নয়। সেটি ছিল ধর্মপ্রাণ ও ইসলামী জ্ঞান- পিপাসু মানুষের মনের দাবী। সে দাবী ছিল সেসব ধর্মপ্রাণ মুসলমান বাঙালীদেরও। বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই এ বিষয়টি নানা ভাষাভাষী ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে চিন্তাভাবনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। একই রূপ প্রয়োজনের তাগিদে ফার্সী ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়েছে আফগানিস্তানে।

তবে জ্ঞানের ক্ষুধা সবার থাকে না। ক্ষুধা তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। স্বাস্থ্য- পতনে যেমন ক্ষুধা লোপ পায়, তেমনি ঈমানের পঁচনে লোপ পায় জ্ঞানের ক্ষুধা। বিশেষ করে ইসলামী জ্ঞানের। তখন ক্ষুধা বাড়ে অখাদ্যে। মুসলমানের ঈমানের সে পঁচনটি ধরা পড়ে জাতিয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সেকুলারিজম ও ইসলামে অঙ্গিকারহীনতার মাধ্যমে। সেটি আরো প্রকট সিম্পটম রূপে ধরা পড়ে দুর্বৃত্তিতে বার বার শিরোপা পাওয়ার মধ্য দিয়ে। ঈমানের এমন প্রকট রোগে কোরআন শিক্ষায় আগ্রহ থাকবে সেটি কি আশা করা যায়? ইসলামী জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে আরবী, উর্দু বা অন্য কোন ভাষা শেখা এজন্যই তাদের কাছে এত অনর্থক মনে হয়। সেকুলার বা বামপন্থি বাঙালীদের কাছে ভাষার গুরুত্ব বিবেচিত হয় সে ভাষায় কথা বলা, গান করা, সাহিত্য রচনা, ব্যবসা- বাণিজ্য ও অফিস আদালত চালানোর মধ্যে। একারণেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনের গভীর আকুতিটি তারা বুঝতেই পারেনি। বরং তারা মনেপ্রাণে ভয় করতো উর্দুকে। কারণ উর্দু নিছক ভাষা ছিল না, ছিল প্যান- ইসলামিক চেতনার প্রতীক। এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল এমন শত শত প্রতিভাবান কবি- সাহিত্যিক, আলেম ও গ্রন্থকার, যাদের মাতৃভাষা উর্দু ছিল না। পাঞ্জাবের আল্লামা ইকবাল তাদেরই একজন। উপমহাদেশের আর কোন ভাষায় এমন নজির নেই। এতে ফল দাঁড়িয়েছিল যেখানেই উর্দু ভাষার চর্চা বেড়েছে সেখানেই জোরদার হয়েছে প্যান- ইসলামিক মুসলিম ভাতৃত্ব। এমন কি পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে সমগ্র ভারত জুড়ে যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপট তৈরী হয় তার পিছনেও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। আজকের পাকিস্তানে এজন্যই সিন্ধুর জিএম সৈয়দের জাতিয়তাবাদী জিয়ে সিন্ধ আন্দোলন এবং সীমান্ত প্রদেশের খান আব্দুল গাফফার খানের পখতুনিস্তান আন্দোলনও মারা পড়েছে। অথচ পাকিস্তান ভাঙ্গার লক্ষ্যে প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিল তারাই। বাংলার সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের কাছে সে ইতিহাস অজানা ছিল না, তাই তারা শুধু রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি নিয়েই খুশি থাকেনি। পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষার চর্চাকেও তারা রুদ্ধ করে দেয়। ফলে ভাষা আন্দোলনের নামে বাংলা ভাষার উন্নয়ন যা হয়েছে তার চেয়ে সেটি ব্যবহৃত হয়েছে পাকিস্তানের অবকাঠামোর মধ্যে বাঙালী মুসলমানের একাত্ম হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রূপে। ফলে প্যান- ইসলামিক চেতনার বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের চেতনা পরিণত হয়েছে এক লৌহ দেয়ালে। রাষ্ট্রভাষা রূপে কোন ভাষাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার অর্থ যে ভাষাকে মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া নয় সে সত্যটুকুও তারা মেনে নিতে রাজী ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বাংলাভাষা কোন কালেই রাষ্ট্র ভাষা ছিল না। শত শত বছর ধরে ফার্সী ভাষা বাংলাদেশে রাষ্ট্র ভাষা ছিল, তখন কি বাংলাকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল? রাষ্ট্রভাষা না হওয়াতে পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পশতু বা বেলুচ ভাষাও কি পাকিস্তান থেকে বিলুপ্ত হয়েছে? অথচ কত মিথ্যাচার না হয়েছে এবং আজও হচ্ছে এ নিয়ে। লাগাতর বলা হয়েছে এবং এখনো অভিযোগ উঠছে, পাকিস্তান সরকার বাঙালীর মুখে ভাষা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে।

আসা যাক ইতিহাসের দিকে। দেখা যাক, বাংলার মুসলমানদের কাছে উর্দু কীভাবে গুরুত্ব পেল সে বিষয়টি। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশের হাতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হওয়ায় মুসলমানদের জীবনে যে শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা নয়, প্রচন্ড বিপর্যয় এসেছিল মুসলমান রূপে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রেও। তারা যে বাংলার অর্থনীতি, বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন শিল্পকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে মসলিন শিল্পিদের আঙুল কেটেছিল তাই নয়, তারা মুসলমানদের মুসলমান রূপে বেড়ে উঠাকে অসম্ভব করে তুলেছিল। তখন বাংলার রাষ্ট্রভাষা এবং সে সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফার্সী। অথচ ইংরেজ শাসকেরা ফার্সী ভাষায় জ্ঞানলাভ অসম্ভব করে। ইংরেজদের হাতে এটিই ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। তখন বাংলার গ্রামে-গঞ্জে হাজার হাজার মাদ্রসা ছিল। ঐতিহাসিক ম্যাক্সমুলারের মতে, ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলায় প্রায় ৪০ হাজারের বেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। সেগুলো চলতো সরকারি অর্থ সাহায্যে বা লাখেরাজ সম্পত্তি থেকে সংগৃহিত আয় থেকে। কিন্তু ইংরেজগণ সেগুলো বন্ধ করে দেয়। এভাবে ইংরেজগণ পরিকল্পনা নেয়, বাংলার মুসলমানদের দ্রুত মূর্খ এবং সে সাথে দরিদ্র বানানোর কাজে। তাই তারা শুধু মসলিন শ্রমিকদের আঙ্গুলই কাটেনি, তাদের শিক্ষার ভাষাকেও নিষিদ্ধ করে। জ্ঞান- বিজ্ঞান ও শিল্পে মুসলমানগণ ব্রিটিশদের প্রতিদ্বন্দ্বি হোক সেটি তাদের কাম্য ছিল না। তাছাড়া ইসলামের শিক্ষা মুসলমানদের আত্মসচেনত করে, আগ্রাসনের মুখে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধীও করে। সৃষ্টি করে জিহাদের জজবা। তাই ইংরেজদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের জ্ঞানচর্চায় বাধা সৃষ্টি করা। আর জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে সরলে, দূরে সরতে হয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা থেকেও। আর এভাবেই অশিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক দুর্গতিও নেমে আসে বাংলার মুসলমানদের জীবনে। এমন কি সেটি ধরা পড়েছে ব্রিটিশ শাসনামলের ইংরেজ আমলা ও লেখক ডব্লিও. ডব্লিও. হান্টারের চোখে। তিনি লিখেছেন, “যেসব মুসলমানদের পক্ষে একসময় দরিদ্র হওয়াই অসম্ভব ছিল এখন ( ইংরেজ নীতির কারণে) তাদের পক্ষে স্বচ্ছল থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ”

বাংলায় ইংরেজ শাসনের ফলে আনন্দ ও প্রতিপত্তি বাড়লো হিন্দুদের। এবং সেটি মুসলমানদের বিস্তর ক্ষতির বিনিময়ে। ইংরেজগণ শুরুতেই বুঝেছিল, মুসলমানগণ কখনই তাদের বন্ধু হবে না। বরং তাদেরকে সব সময়ই তারা হানাদার ভাববে। ফলে ভারত শাসনকে দীর্ঘায়ীত করার লক্ষ্যে তারা পার্টনারশিপ গড়ে তোলে হিন্দুদের সাথে। তখন সবচেয়ে বেশী সুবিধা পায় বাঙালী হিন্দুগণ। মুসলমানদের দাবীয়ে রাখার পাশাপাশি ইংরেজদের পলিসি হয় হিন্দুদের উপরে তোলা। এবং সেটি শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে। ইংরেজগণ তখন মুসলিম শাসনামলের ভূমি আইন পরিবর্তন করে চালু করে চিরস্থায়ী প্রথা যার ফলে সৃষ্টি হয় অর্থশালী হিন্দু জমিদার শ্রেণী। হিন্দুগণ তখন ইংরেজী ভাষা শেখার পাশাপাশি বাংলাভাষা গড়ে তোলাতেও মনযোগী হয়। বাংলাভাষার উন্নতি কল্পে ইংরেজ মিশনারীগণ গড়ে তোলে ছাপাখানা। বাংলাভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে এগিয়ে আসে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ন্যায় বিশাল এক ঝাঁক সাহিত্যিক। তাদের সাহিত্যের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার হিন্দুদের মাঝে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাগরণ আনা। এসব হিন্দু সাহিত্যিকদের সাহিত্যে শব্দ, উপমা ও দর্শন সংগৃহীত হত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ, রামায়ন, মহাভারত থেকে। বাংলা মুসলমানদের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের রচিত এ সাহিত্যে মুসলমানদের মনের খোরাক ছিল না। মিটতো না তাদের শিক্ষা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন। ফলে হিন্দুদের রচিত এ সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙালী হিন্দুদের মাঝে রেনেসাঁ শুরু হলেও মুসলমানদের উপর তার কোন প্রভাবই পড়েনি। তখন অশিক্ষা ও বিপর্যয় থেকে বাঁচবার জন্য মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্যচর্চায় হাত দিতে হয়। মুসলমানদের তখন ধাবিত হতে হয় অধিকতর সমৃদ্ধ উর্দু ভাষার দিকে। নিছক চাকুরী ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে আজ কোটি কোটি বাঙালী ইংরেজী শিখছে। এবং সে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় শত শত ঘন্টা ব্যয়ও করছে। কিন্তু তখন বাংলার মুসলমানদের উর্দু ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা ছিল আরো বেশী। সেটি চাকুরীর প্রয়োজনে ছিল না, ছিল মুসলমান রূপে বাঁচার প্রয়োজনে। অনন্ত- অসীম জীবনের আখেরাত বাঁচাতে। এবং সে প্রয়োজনেই বাংলার বুকে গড়ে তোলা হয় নতুন মডেলের মাদ্রাসা। শুরু হয় উর্দু চর্চা। ১৯৩৭ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার। এরপর জোরদার হয় উর্দু শিক্ষার উদ্যোগ। ১৯৩৯ সালের ২৯ ডিসেম্বরে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা দেন,

“আমি দৃঢ় ভাবে এ মত পোষন করি, যাদের মাতৃভাষা বাংলা সেসব মুসলমান ছাত্রদের সবার জন্য উর্দুভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। ” - ( সূত্রঃ Star of India, 9 April, 1936)

এরপূর্বে ১৯৩৮ সালের ৩রা এপ্রিল মুসলিম লীগের আসানসোল সম্মেলনে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সংহতির স্বার্থে উর্দুকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করার উপর জোর দেন। - ( সূত্রঃ Star of India, 9 April, 1938. p6) । বাংলার মুসলমানদের সৌভাগ্য হলো, হিন্দুদের মাঝে রেনেসাঁ মুসলমানদের তুলনায় অনেক আগে শুরু হলেও তারা অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতা হাতে নিতে পারেনি। শাসন ক্ষমতা যায় মুসলমান প্রধানমন্ত্রীদের হাতে এবং সেটি প্রায় একযুগ স্থায়ী হয়। প্রধানমন্ত্রী হন জনাব ফজলুল হক, জনাব সোহরোওয়ার্দী ও জনাব নাজিমুদ্দিন। এবং সে সরকারের শিক্ষানীতির ফল হলো, সে সময় বাংলার বুকে শিক্ষিত এমন কোন বাঙালী মুসলিম পাওয়াই কঠিন ছিল যে উর্দু ভাষা জানতো না। অনেকে ফার্সীও জানতো। শুধু ফজলুল হক নন, উর্দুর পক্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দী। তিনি বলেছিলেন, “উর্দু এবং উর্দু ও ফার্সীর বর্ণমালা হলো আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষার দুইটি লৌহ দেওয়াল”। - ( সুত্রঃ Star of India, 28th April, 1936) । সৈয়দ আমির আলী বলেন,

“আরবী এবং উর্দু সমগ্র ইসলামী বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের আবেগ ও অনুভূতির একতা গড়ে তোলে। একতা ছাড়া আর কোথায় অধিক শক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে?” - ( সুত্রঃ The Spirit of Islam, London, 1955।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এমনকি কিছু ইংরেজ পন্ডিত ব্যক্তিও। তখন বাংলার ডি. পি. আই ছিলেন W.W. Hornwell । তিনি লিখেন, “The question of Urdu is the question of life of death of Mohammadan education in Bengal.”– (The Mussalman, 22 June 1917, p2-3). তার বক্তব্য ছিল, মোঘল শাসনের অবসানের পর ফার্সীচর্চাকে বাংলায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। এবং বাংলার মুসলমানদের বাংলাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। অথচ সমস্যা হলো, বাংলা ভাষা হলো হিন্দুদের সাম্প্রদায়ীক ধারণা, ঐতিহ্য এবং দর্শনের ভাষা যা মুসলমানদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। তার অভিমত ছিল, বাংলার মুসলমানদেরে বাংলা শিখতে হবে কারণ এটি তাদের মাতৃভাষা। তবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হলো, সংস্কৃতির ভাষা উর্দু ও ফার্সী। তিনি এ কথাও উল্লেখ করেন, “এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করেই বাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানগণ উর্দু ভাষা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ”

এমন একটি উপলব্ধি নিয়েই তিনি পরামর্শ রাখেন, বাংলার সকল মুসলমানদের জন্য উর্দু ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হোক। এছাড়া তিনি উর্দু প্রশিক্ষণ স্কুল এবং উপযোগী উর্দু পাঠ্যবই প্রস্তুতেরও পরামর্শ রাখেন। - ( সুত্রঃ The Mussalman, 22 June 1917, p 2-3)।

বাংলা সাহিত্য নিয়ে হিন্দুদের অভিমত কি ছিল সেটিও দেখা যাক। শনিবারের চিঠিতে লেখক পরিমল গোস্বামী জোরের সাথে লেখেন,

“বাংলা সাহিত্য হলো মূলতঃ বাঙালী হিন্দুদের অবদান। সেহেতু বাংলার সাথে হিন্দুর আধ্যাত্মীক সংযোগ। এবং মুসলমানগণ বাংলার উন্নয়নে কোন কাজই করেনি। সুতরাং তাদের এর প্রতি কোন দরদও নেই”। - ( সুত্রঃ শনিবারের চিঠি, ১০ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তীক ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩)

এ প্রসঙ্গে জয়া চ্যাটার্জীর লেখা “বাঙলা ভাগ হলো” বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া যাকঃ

“বাংলার হিন্দু জাগরণের কথা লিখতে গিয়ে যদুনাথ সরকার আধুনিক বাঙলার ইতিহাসে মুসলমানদের অবস্থানকেও অস্বীকার করেন। তার কথা, আধুনিক বাঙলা হলো হিন্দু ভদ্রলোকদের সৃষ্টি। ব্রিটিশদের কাছ থেকে আহৃত দীপ্তির সাহায্যে তারা বাঙলাকে পুনরায় ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। অধিকার বলেই বাংলা তাই তাদেরই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নব জাগরণই হলো শুধু ভদ্রলোকের সংস্কৃতির প্রতীক নয়, সেই সঙ্গে একটি হিন্দু বাঙলার, যেখানে মুসলমানের ঠাই নেই”। ( জয়া চ্যাটার্জী, ২০০২)

উর্দু শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে তখন বাংলায় গড়ে উঠে বহু সংগঠন। অনুষ্ঠিত হয় নানা শহরে সম্মেলন। ১৯১৭ সালে এমনই একটি সম্মেলন হয়ছিল বরিশালে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বরিশাল কনফারেন্সে যে প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছিল তা হলোঃ

- আরবী ও ফার্সী ভাষার শিক্ষাদান ৭ম শ্রেণী থেকে নয়, ৫ম শ্রেণী থেকে শুরু করতে হবে।
- যাদের মাতৃভাষা উর্দু নয় তাদের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃত দিতে হবে।
- কোলকাতা মাদ্রাসা ও অন্যান্য মাদ্রাসার নিম্নশ্রেণীতে বাংলা ও উর্দুকে একে অপরের বিকল্প ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। -(সুত্রঃ The Mussalman, 11 May 1917 p3)

১৯০৮ সালের ১৮ই এপ্রিলে পূর্ণিয়াতে অনুষ্ঠিত হয় মোহমেডান এডুকেশন কনফারেন্স। সে কনফারেন্সে সৈয়দ আব্দুল্লাহ সোহরোওয়ার্দী বাঙলার মুসলমানদের উর্দু শেখার প্রতি আহবান জানান। - ( সুত্রঃ The Mussalman, 24 April 1908 p5.)। ১৯৩৩ সালে ২রা জুলাই কিদিরপুরে অনুষ্ঠিত হয় বেঙ্গল প্রাদেশিক উর্দু কনফারেন্স। সে অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জনাব এস. ওয়াজেদ আলী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র ও ঐক্যের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার স্বার্থে উর্দু জরুরী। -(সুত্রঃ The Mussalman, 4 July 1933 p.9)।

বাঙালী কেন উর্দু কনফারেন্স করবে? কেনই বা উর্দুর পক্ষে কথা বলবে সেটি আজকের মত সেদিনেও অনেকের মনে উদয় হয়েছিল। তখন তার ব্যাখ্যা দিতে উর্দু সম্মেলনের জনৈক সেক্রেটারি বলেন, “উর্দু সম্মেলন বিশুদ্ধভাবে মুসলমানদের নিজস্ব ব্যাপার। তাই এটি ভিতরের আহ্বান”। - ( সুত্রঃ The Mussalman, 5th July, 1933, p2)। অর্থাৎ উর্দুর প্রতি তাদের এ আগ্রহের পিছনে কোন সরকারের বা গোষ্ঠীর চাপ ছিল না। বরং তারা সেটি করেছেন নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে। পুষ্টিকর খাদ্যের সন্ধানে স্বাস্থ্য- সচেতন ব্যক্তি মাত্রই নিজ গরজে রাস্তায় নামে, কারো চাপের প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাতেও উর্দুর প্রতি এমন এক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি এক প্রয়োজনের তাগিদে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বহু বাংলাভাষী নেতা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী করেছিল তেমনি এক প্রেরণা থেকে। এমন একটি প্রেরণাকে কি পশ্চিম পাকিস্তানীদের চাপিয়ে দেওয়া ষড়যন্ত্র বলা যায়? উর্দুতো পাকিস্তানের কোন এলাকার ভাষা ছিল না। বাঙালী বুদ্ধিজীবীগণ ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গে সে বিষয়টি আদৌ সততার সাথে বিবেচনা করেনি।

ইসলামী জ্ঞানের বিশাল ভান্ডারের পাশাপাশি উর্দু ভাষার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের আরেকটি রাজনৈতিক সুবিধাও হাছিল হয়। সেটি হলো, আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠে ভারতের বিভিন্ন কোণের মুসলমানের সাথে। তখন বাংলার রাজধানী কোলকাতা পরিণত হয় উর্দুভাষার অন্যতম কেন্দ্রে। এ শহর থেকেই তখন প্রকাশিত হত তৎকালীন ভারতের জাগরণ সৃষ্টিকারি আল হেলাল ও হামদর্দের ন্যায় বহু উর্দু পত্রিকা। আল হেলালের সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তখন তিনি খেলাফত আন্দোলনে পক্ষে জনমত গড়ে তুলছিলেন। হামদর্দের সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মহম্মদ আলী জওহর। তিনি ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের নেতা। এসব পত্রিকার কারণেই বাংলার মুসলমানদের মাঝেই শুধু নয়, জাগরণ আসে এবং প্যান- ইসলামী চেতনা গড়ে উঠে সমগ্র ভারত জুড়ে। ফলে অবাঙালী মওলানা মহম্মাদ আলী, শওকত আলী, আবুল কালাম আযাদ পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনে একাত্ম হতে বাংলার মুসলমানদের কোনে সুবিধা হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল অনুপ্রেরণা তো এসেছিল এই প্যান- ইসলামী চেতনা থেকেই। তাই ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো তখন রাষ্ট্র ভাষা রূপে উর্দুই প্রাধান্য পাবে সেটিই কি স্বাভাবিক ছিল না? কিন্তু বাঙালী সেকুলারিষ্টগণ সেটিকে দেখেছে বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রূপে।

মুসলিম মানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের নায়কদের বড় সফলতা হলো, বাঙালী মুসলমানদের হাতে এ আন্দোলনটি একটি প্রায়োরিটির তালিকা ধরিয়ে দিয়েছে। সেটি হলো, তারা প্রথমে বাঙালী। তারপর বাংলাদেশী। এবং তারপর মুসলমান। ভাষা আন্দোলন কতটা গভীরভাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের ডি-ইসলামাইজড করেছে এ হলো তার উদাহরণ। এটি হলো সেকুলারাইজেশনের এক চুড়ান্ত বিজয়। অথচ মুসলমানের কাছে তার মুসলমান পরিচিতিটিই মূল। আল্লাহর কাছে বিচার দিনে তার মুসলমান পরিচিতিটি কতটা

স্বার্থক, কতটা সফল ও কতটা আপোষহীন সে হিসাব দিতে হবে। অথচ কে কতটা বাঙালী রূপে বাঁচলো সে প্রশ্ন সেদিন উঠবেই না। প্রশ্ন হলো, যে পরিচয় মহান আল্লাহর কাছে গুরুত্ব রাখে না সে পরিচয় মুসলমানের কাছে গুরুত্ব পায় কীরূপে? এটি কি ঈমানের স্খলন নয়। অথচ সেটিই হয়েছে বাঙালী মুসলমানের জীবনে। এমন কি তা থেকে অনেক ইসলামপন্থিরাও রেহাই পাননি। প্রচন্ড শ্রোতে শুধু কচুরীপানাই ভাসে না, অনেক শিকড়ধারীদেরও যে ভাসিয়ে নেয়। সে স্খলন যে কতটা ইসলামপন্থিদের আচ্ছন্ন করেছিল তার উদাহরণ দেওয়া যাক। ভাষা আন্দোলন নিয়ে কবি ফররুখ আহম্মদ কবিতা লিখলেন, "মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা, খোদার সেরা দান"। তিনি ভূলেই গেলেন, আল্লাহর সেরাদান ভাষা নয়, সেটি হলো আল- কোরআন। ভাষা শেখাতে নবী পাঠাতে হয় না। ফেরেশতাদেরও দুনিয়াতে আসতে হয় না। অথচ কোরআন শেখাতে ফেরেশতা ও নবীজী ( সাঃ) পাঠাতে হয়েছে। তাই ভাষাকে খোদার সেরা দান বললে আল- কোরআনের মর্যাদাহানী হয়। মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা সিরাতুল মোস্তাকিম দেখায় না, পরকালীন মুক্তিও দেয় না। সে পথ দেখায় কোরআনী জ্ঞান। সবারই মাতৃভাষা থাকে। পাপুয়া নিউগিনিতে এখনও যারা প্রস্তর যুগের অসভ্যতা নিয়ে বাস করছে তাদেরও মাতৃভাষা আছে। তবে যা নেই তা হলো তাদের জীবনে সিরাতুল মোস্তাকিম। তাই মায়ের ভাষাকে খোদার সেরা দান বলা যায় কি করে? মায়ের ভাষাতো পশুপাখীরও থাকে। মায়ের ভাষা অন্ধকারেও টানতে পারে, জাহান্নামেও নিয়ে যেতে পারে, যদি তা ঈমানের খাদ্য না জুগায়। মায়ের ভাষা সেরা হলে মিশর, ইরাক, সিরিয়া, সূদান, আলজিরিয়া, মরক্কো, তিউনিসা, লিবিয়ার মানুষ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবরস্থ করলো কেন? ফররুখ আহমদের মত ইসলামের জাগরণের কবির এরূপ কবিতা বাংলাদেশে ইসলামের পক্ষের শক্তির অনেকের মনেই বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। তার এ কবিতায় বিভ্রান্ত হয়ে ভাষা আন্দোলনের ন্যায় বাংলার মুসলিম ইতিহাসের একটি আত্মঘাতি ঘটনা নিয়েও অনেকে অহংকার করতে শিখেছে।

তমুদ্দন মজলিসের নেতারা নিজেদেরকে ইসলামী তাহজিব ও তমুদ্দনের সেবক মনে করেন। অথচ তারা ভাষা আন্দোলনের নামে ইসলাম- বিদ্বেষীদের দলে ভীড়ে তাদের মাঠকর্মী রূপে খেটেছেন। ডক্টর শহিদুল্লাহও বলে বসলেন, আমি প্রথমে বাঙালী, তারপর মুসলমান। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন একজন সূফী রূপে। তিনি ছিলেন ফুরফুরার পীরের খলিফা। কিন্ত খলিফার মুখে একি কথা! তার প্রধানতম গর্ব ছিল বাঙালী হওয়া নিয়ে। মুসলমান হওয়া নিয়ে নয়। কথা হলো, এটা কি ইসলামের শিক্ষা? ইসলাম শুধু ব্যক্তিকে নামায- রোযা ও হজ- যাকাতে নিয়ত বাঁধতে বলে না। বাঁচা- মরা ও প্রতিটি চেষ্টা- প্রচেষ্টার মধ্যেও নিয়ত বাঁধতে বলে। যেমনটি হযরত ইবরাহীম ( আঃ) বেঁধেছিলেন। আর সেটি হলো, "আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার বাঁচা এবং আমার মৃত্যু সবকিছুই রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহর জন্য"। হযরত ইব্রাহীম ( আঃ) এর এমন নিয়তে মহান আল্লাহতায়ালা এতই খুশি হয়েছিলেন যে তাঁর সে কথাগুলোকে চিরকালের জন্য সকল ঈমানদারদের জন্য অনুকরণীয় করে রেখেছেন। মুসলমানের জীবনে প্রকৃত সফলতা মিলবে কে কতটা এ নিয়ত পালনে সফল হলো তার উপর। বস্তুতঃ মুসলমান তাঁর জীবনে ভিশন, মিশন ও প্রায়োরিটি পায় এ আয়াত থেকে। তাঁর মুসলমানিত্ব নির্ভর করে এমন মিশন নিয়ে বাঁচার মধ্যে। মুসলমানের জীবনে রাষ্ট্র নির্মাণ ও রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, বন্ধুত্ব ও সম্পৃতির মূল নিয়ন্ত্রক হবে এমন নিয়েত। এখানে ভাষার কোন স্থান নেই। গায়ের রং ও ভূগোলেরও কোন স্থান নেই। মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো প্যান- ইসলামিক হওয়া। কিন্তু যে ব্যক্তির জীবনে প্রথম প্রায়োরিটি হয় বাঙালী হওয়া, তার কাছে কি অন্য ভাষার মুসলমানের সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে একাত্ম হওয়া গুরুত্ব পায়? অথচ মুসলমানদের কাজ তো হলো নানা ভাষাভাষী ও নানা অঞ্চলের হয়েও এক দেহে লীন এক উম্মাতে ওয়াহেদা গড়া। নামায- রোযা আদায়ের ন্যায় এটিও তো ফরয। কিন্তু যখন প্রথমে বাঙালী হওয়াটাই প্রায়োরিটি হয় তখন ভাষাই রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জীবনের বহু কিছুর নিয়ন্ত্রক হয়ে যায়। অভিন্ন বাংলা ভাষার নামে তখন অন্য বাঙালী তা সে হিন্দু হোক, খৃষ্টান হোক, বৌদ্ধ হোক বা নাস্তিক হোক তাদের সাথে একাত্ম হওয়াটাই গুরুত্ব পায়। তখন গুরুত্ব হারায় অন্য ভাষাভাষী তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে একতা গড়ার বিষয়টি। তাই ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালীদের মনে গুরুত্ব হারায় পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়টি। বরং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ভারতের পশ্চিম বাংলার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর করার বিষয়টি। ফলে বাঙালী মুসলমান শুধু পাকিস্তান ও উপমহাদেশের মুসলমান থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মুসলিম জাহান থেকেও। তাই কাশ্মীর বা আরাকানের মজলুম মুসলমানদের মুক্তির বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ মাথা ঘামায় না। নির্যাতিত ফিলিস্তিনীদের জন্যও এদেশ থেকে তেমন সাহায্য যায় না। বাংলাদেশের সেকুলার রাজনীতিতে এগুলো কোন প্রসঙ্গই নয়।

যখন কোন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাষা শিখে তখন তার সাথে শুধু মুখের যোগযোগই বাড়ে না, বাড়ে আত্মার সংযোগও। তখন গড়ে উঠে আত্মীক সম্পর্কও। ভাষার মূল কাজ তো এই সংযোগই গড়া। বাংলা ভাষা চর্চার পাশাপাশি উর্দু শেখার কারণে বাংলার মানুষে যে লাভটি হয়েছিল তা হলো এতে উপমহাদেশের অন্য মুসলমানদের সাথে তাদের সংযোগটি বেড়েছিল। জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়েছিল তাদের মনে। বেড়েছিল ঔদার্য। ফলে বাঙালী মুসলমানগণ সামর্থ পায় উপমহাদশের অন্য মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ফল দাঁড়ালো, অন্য ভাষার অবাঙালী ভাইয়েরা চিত্রিত হতে থাকলো ছাতুখোর দুষমন রূপে। অথচ এক মুসলমান যে অন্য মুসলমানের ভাই সে খেতাবটি মহান আল্লাহর দেওয়া। তাই মুসলমানগণ একে অপরকে ভাই বলবে সেটি ঈমানী দায়বদ্ধতা। তাই ভাই না বলার যে সামর্থহীনতা তা মূলতঃ ঈমানেরই দূর্বলতা। অথচ বাঙালীর মনে সে অসম্পন্নতাই প্রবলভাবে বাড়িয়ে দেয় ভাষা আন্দোলন। এভাবে ছিঁড়ে ফেলা হয় পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মাঝে প্যান- ইসলামী বন্ধন। অথচ এটি শুধু রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অপরাধই নয়, ইসলামের দৃষ্টিতে হারামও। এমন বিচ্ছিন্নতাই যেকোন মুসলিম জনপদে আল্লাহর আযাব অনিবার্য করার জন্য যথেষ্ট। এমন আযাবের জন্য পুতুল পুজার প্রয়োজন নেই। সে হুশিয়ারিটি মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এভাবে দিয়েছেন,

“এবং তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা সুস্পষ্ট ঘোষণা আসার পরও পরস্পরে মতভেদ ও বিভক্তি গড়লো। তারাই হলো সে সব ব্যক্তি যাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব”। - ( সুরা আল- ইমরান, আয়াত ১০৫)

আল্লাহপাক শুধু একতা গড়াকেই ফরয করেননি, বিভক্তি গড়াকেও এভাবে হারাম করেছেন। তাই ঈমানদার ব্যক্তি শুধু নামায- রোযাতেই মনযোগী হয় না, অতি একনিষ্ঠ হয় মুসলমানদের মাঝে একতা গড়তে এবং সে সাথে বিভক্তি এড়াতেও। এমন এক সমৃদ্ধ ইসলামি চেতনার কারণেই ১৯৪৭য়ে বাংলার মুসলমানরা অন্য ভাষী মুসলমানদের সাথে একত্রে পাকিস্তান গড়েছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে প্রচন্ড নাশকতায় সেটি বিলুপ্ত হয়েছে। এর ফল দাঁড়ালো, বাঙালী মুসলমানেরা আজ থেকে শত বছর আগে যে চারিত্রিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সামর্থের অধিকারি ছিল তার চেয়ে বহু গুণ পিছিয়ে পড়লো। শত বছর আগে অন্ততঃ অন্য ভাষা, অন্য বর্ণ ও অন্য ভূগোলের মুসলমানদের ভাই বলার সামর্থ ছিল, তাদের সাথে একত্রে রাজনীতি করা এবং সে সাথে যুদ্ধ করারও আগ্রহ ছিল। সুদূর বালাকোটের রণাঙ্গনে সৈয়দ আহম্মদ বেরেলেভীর সাথে বহু বাঙালী মুসলমান শহিদও হয়েছিলেন। এখন সেটি বিরল। অন্য ভাষার মুসলমানদের সাথে এখন শুধু ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতাই বাড়েনি, বেড়েছে মনের দূরত্বও। দিন দিন সেটি আরো গভীরতর হচ্ছে। অপর দিকে ঘনিষ্টতা বাড়ছে ভারতসহ অন্যদেশের অমুসলমানদের সাথে। অমুসলমানদের সাথে স্থাপিত সে ঘনিষ্টতা যেমন উৎসবে পরিণত হয়েছে, তেমনি উৎসবে পরিণত হয়েছে মুসলমানদের সাথে বিচ্ছিন্নতাও। অর্থাৎ দেশ চলছে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায়। আত্মঘাত আর কাকে বলে? এভাবেই ভাষা আন্দোলনের নাশকতা বাংলাদেশে ষোল কলায় পূর্ণ হচ্ছে।

( লেখকের অন্যান্য লেখার জন্য দেখুন, www.firozmahboobkamal.com )

## গ্রন্থপঞ্জিঃ


- সরকার শাহাবুদ্দীন আহম্মদ, ২০০৪; আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, দ্বিতীয় খন্ড, বুকস ফেয়ার, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
- জয়া চ্যাটার্জী, ২০০২; বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ- বিভাগ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা. এ. ঢাকা ১০০০।